পাতার কোলাহল

কাজল কানন

পাতার কোলাহল

প্রকাশনী

কাজল কানন
পাতার কোলাহল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রকাশক :

স্বত্ব: খোশনে আরা খুশি
প্রচ্ছদ : মামুন হোসাইন
মূল্য :

PATAR KOLAHOL
A poetry book by Kazol Kanon
Cover: Mamun Hossain

উৎসর্গ
কবি আমিনুর রহমান সুলতান

সূচি

০৯. নদী
১০.সাধুর টঙ
১১. আমাদের ছেলেবেলা
১২. আম্মা চিল হয়ে যেতে পারতেন
১৪. কবি ও কবিতা
১৫. কদমতলায় দিও দেখা বন্ধু
১৬. পরান ব্যাপিয়া যাও
১৭. সহমরণে নাই
১৮. সর্বপ্রাণ
১৯. প্রকল্প
২০. ফিদেল
২১. বোধোদয়
২২. তোমার গ্রাম
২৩. দুরারোগ্য গান
২৪. দাউ দাউ করে জ্বলছেন যিনি
২৫. স্বপ্নবধের বিদ্যা
২৬. আমাতে-তোমাতে ক্রমবিকাশ
২৭. তোমার আলোকপ্রাপ্তি ইতিহাসের হেতু নয়
২৮. কুয়াশায় ঘুমের চুমু

২৯. উনমানুষের দড়ি খেলা
৩০. উন্নয়ন প্রসূত চমকের দিকে
৩১. বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা
৩২. বেতাল বসন্ত
৩৩. সখার আয়না
৩৪. বলুন মাননীয়
৩৫. বাইচ
৩৬. আসক্তি ও দস্তার সুর
৩৭. শিরোনামহীন
৩৮. গাছ
৩৯. মন আছে মৌনতা নেই
৪০. জল্লাদের পরিপত্র
৪১. ভবে মোর দেহতরী
৪২. রাতে মিশে গিয়ে তৈরি করেছি লোককলঙ্ক
৪৩. হাটুরে
৪৪. সরকার ঘাস কাটে
৪৫. এরপরও তোমাকে দেখতে থাকি
৪৬. জীবনব্যাপিয়া বাঁচো
৪৭. চোতা
৪৮. কিছু সময় নদীবর্তী কুয়াশায় গেঁথে গেল

নদী

আমাদের কোনো এক নদী থাকে, থাকে তার জলীয়
সংলাপ; প্রার্থিত তলদেশ অতটা তল নয়, যতটা
আমরা মনে করে থাকি; দূর পাড়ে কোনো সুন্দরী ঢেউ
আছড়ে পড়ার আগে তটের জবান খুলে যেতে থাকে।

নদী আমাদের ভেতর খলবল করে, পরস্ত্রীর গতরভাষা যেমন
দুর্বোধে লতিয়ে ওঠে; মহকালের ভেতর মৌন সংলাপ— যার
উদ্দেশ্য আর বেঁচে নেই; সেই অমীমাংসিত বাকধারা হয়তো
আছে কোনো কাঠুরের কাছে, যিনি এক দুর্জ্ঞেয় রাজ্যের গণপতি।
নদীর আখ্যান জেনে আমরা তার বহতা মঙ্গল বুঝতে চাই,
একবার দু'বার দশবার মৃত্যু হলেও নদীর কথা বলতে বলতে
কাদায় বসে মাছের ডিম ফাটিয়ে উল্লাস করি।

নদীর ওপারে নীলিমার বিধবা মা, এপারে বড়ুয়া বাবু–
সময়ের হীরকজটে দু'জনই এখন ধাতবসন্ধ্যা; এ কারণেই
তাদের ইতিহাস পড়া হয় না— আমরাও জনতা ইতিহাসে
কিছুই পাবো না; তবুও মাঝে মধ্যে সমীহ জাগিয়ে
শাসক-প্রশাসকের ভাগ্য গড়ে দিই, এই সরল-বিরল
কর্মে আমরা ইতিহাসখ্যাত।

নদী কারো কারো তামাদি স্বপ্নের বহতা। আমরা সাধারণ,
স্বপ্ন আমাদের কারবার না, তবুও এক ধরনের অভিলাষ
ঘিলু তড়পায়! যা তামাদি হয়ে যাওয়ার আগে স্বপ্নের মতো
দেখায়। এই আসমানি ধারণা, গাছ-পাতা-ঘাসের ঝোপ থেকে আসা।

সাধুর টঙ

কিছুই দরকার নেই, পানি পানের বাটিও না
শুধু নিজের ছায়াটুকুর নিরঙ্কুশ দখল চাই।
ছায়ার মালিকানা হারানো মানুষ অন্ধকার
যদিও অন্ধকার আমি মন্থন করি
মাতৃস্তনের মতো নিষ্কণ্টক পান করি
এরপর বুক বিঁধে যায় আলোর শর্তায়নে
বৃষ্টি শর্তে মেঘ, মেঘ শর্তে বৃষ্টি এই পৃথিবীর
মতো কাঁদায় না, কাঁদতেও পারে না।
কারো জন্য অপেক্ষা করে নেই, নেই আমি
কোথাও বা কারো বিছানায়
নিরুত্তর নির্বিকার আছি আপন অস্তির পাশে।
কেউ এসে গেল নাকি, কারো মুখের মতো
আবছা একটা মেঘ খণ্ড মনে হলো
শাসনতন্ত্র হারিয়ে ফেলা একদল প্রাণী
প্রাণের বিনিময় হাতে করে ফিরছিল
তারা ফিরছিল গোনাঙ্গসহ
আমরা যারা এসব নিয়ে ভাবি না অথবা
জিনিসটাই মরে গেছে, তার পাশে বসে আছি
আর গোপন করছি যৌনাশা ভরা মস্তিষ্ক।
যদিও গোপন কিছু নেই, নেই প্রকাশেও
তবুও সবকিছু ফেলে রেখে হেঁটে যাওয়া
যায় আত্মবিলোপের দিকে।

আমাদের ছেলেবেলা

আমরা সাধারণ ঘরের সন্তান; শিশুকালে একটা লেবেঞ্চুষের
জন্য জিভে পানি নেমে আসতো, সেই পানি চেটে-পুটে তৃপ্ত হতাম।
তখন লেবেঞ্চুষ বড় বিস্ময়কর পাওয়া;
সবার হাতে ধরা পড়তো না।

শিশুকাল আমাদের অন্তর্দর্শী আয়না
সরিয়ে রাখলে কিছুই দেখা যায় না।

আমাদের চলা-বলায় একটা বুনোভাব থাকায়
সহেজই চেনা যায় আমরা গ্রাম্য; এই বুনো আমাদের
ক্ষয়িষ্ণু ক্রন্দনের ভেতর লুকিয়ে রাখে; আমরাও ক্রন্দনের
সঙ্গে বাঁচতে চাই বলে, বয়স বাড়লে লেবেঞ্চুষের
দাবি ছড়িয়ে পড়ে রক্তে।

সায়েদাবাদের সাথী হোটেল, তোতা মামার
ছাত্র ইউনিয়ন সব আছে
কেবল তোতা মামার প্রেম বিক্রি হয়ে গেছে
ত্রিশ হাজার টাকা যৌতুকে।
আরো কয়েক বছর আগে শুনেছি তোতা মামা মালয়েশিয়ায়
রাবার বাগানে কাজ করেন।
আমরা সাধারণ ঘরের সন্তান
আমাদের আধুনিক মন নেই, মনে হওয়াও নেই; তাই তোতা
মামার বিপ্লবী রাজনীতি ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের কিছুই মনে হয়নি

আম্মা চিল হয়ে যেতে পারতেন

আমাদের আম্মা খড়-বিচালি আর পাটকাঠির
আগুনে শাক-শুঁটকি রাঁধতেন
হাওয়ার ঘ্রাণে ভাসতো ক্ষুধার্তের অভিলাষ; যতটা
সম্ভব চোখ বড় করে বলক ওঠা হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে
থাকতাম। এভাবে হাঁড়ির ভেতর আমাদের স্বপ্নজারি
হতো— ভাতের চেয়ে বড় কোনো স্বপ্ন ছিল না; এখনো নেই।

আম্মা বড় আগুন ঘনিষ্ঠ সংসার করতেন আব্বার সঙ্গে।
তিনি একটু ফুরসত পেলেই পুকুরপাড়ের
তেঁতুলছায় বসতেন; আম্মা তেঁতুলছায় বসে কোন ভাবনায়
তাড়িত হতেন, আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি।
আমাদের এই অবিস্মরণীয় অজ্ঞতা এক স্বর্গীয় চেতনা সৃষ্টি করেছে।

আমরা আম্মাকে প্রাণখোলা মানুষ বলতে পারবো না।
তবে তার মধ্যেও একটা প্রাণ রয়েছে, এ নিয়ে আমরা
সংশয়মুক্ত ছিলাম। তিনি চিন্তাকে ডুকরে ডুকরে মাথা
থেকে পেটে, পেট থেকে বুকে জড়ো করতেন— এই বিরল
কর্মে তার সৃষ্টিগুলো আমরা চুষে খেয়েছি।
এ সময় আমাদের উদরপূর্তি হতো তার রক্ত-মাংস দিয়ে।

আম্মা যখন একা বোধ করতেন
আমরা বাষ্পের মতো মিলিয়ে যেতাম চারপাশে কিংবা
তার দীর্ঘশ্বাস পান করে আয়ুর পিঠে চড়তাম। যদিও ওই
একাকীত্ব কোনো দুরূহ ব্যাপার নয়, এক থাল
ভাতের মতো উদ্বুদ্ধকারী।

আম্মা চাইলেই চিল হয়ে যেতে পারতেন
কেন যে তিনি চিল হলেন না!

আম্মা এক সাধুর মোকামের কথা বলতেন, সেখানে নাকি
মানুষ মানুষের জন্য অপেক্ষা করে আর ক্ষণে ক্ষণে চিল
উড়ে যায় আরেক চিলের কাছে। আম্মা সেই উড়ন দৃশ্য
দেখতে দেখতে বিপন্ন হয়ে পড়তেন
এ সময় তাকে অচেনা লাগতো।

আম্মা তার খেলনাপাতিগুলো গামছায় বেঁধে আব্বাকে
দিয়েছিলেন, আব্বা সেগুলো কোথায় যে রেখেছিলেন আর
জানা যায়নি। তাই আমাদের খেলনাপাতির উত্তরাধিকার
বলতে পাশবাড়ির খেলা দেখা।

কবি ও কবিতা

কবি আমাদের জন্য অহরহ বর্ষণ প্রার্থনা করেছেন
তিনি উদ্ভিদ ও কান্নার অধিকারের কথাও বলেছেন
আমরা তখন ওই জনপদের মানুষ আকাশে মাটি
লেপন করছিলাম, তবে আমাদের হাত মুক্ত ছিল না;
আমরা শস্য আর সন্ধ্যার কথাও ভাবতাম।
রাত্রি বদল করতাম দিনের সঙ্গে দিন বদল
হতো আত্মার সঙ্গে

কবিকে আমরা প্রাণেশ্বর ভাবতে পারতাম
আমাদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত ভালোবাসলেও
সঙ্গীতের শিল্পীকে পছন্দ করেন না
অন্যদিকে আমরা ছাল ছাড়িয়ে যে বিচির সন্ধান
করি– কবি এটিকে গর্হিত মনে করেন

তিনি নিঃসঙ্গ হেঁটে পার হয়ে গেলেন আমাদের।
আমরা তার ছাই-ভস্ম পেলাম হাতে
এখন তার থেকেই জন্মাচ্ছে লতা-পাতা নদী।

কদমতলায় দিও দেখা বন্ধু

আমাদের বন্ধুর মন অত সহজ জিনিস নয়–
আকাশ বা সমুদ্রের মতো হবে।
সত্যের মতো রক্ষণশীলও নয়;
তার ফড়ফড়ে বিহার উদ্বেল উদ্বান্ত করে
আবার কিছুই না, দড়ি হাতে রাত-বিরাতে
ঘুরে আমাদের দেখা হয়ে যায় নির্জন তরজমায়।
কঠিন এক ঘুমের শেষে জাদুময় অমরতা
আমাদের খেয়ে ফেলে
ভেতরে জেগে ওঠে বন্ধুপরমজ্ঞান।

থৈ নাই থৈ নাই আসমান ব্যাপিয়া থাকে কাকের
চোখ; কাক আমাদের প্রতিদিনের কথা হয়তো
আহার করে বাতাস থেকে।
ভাতের ফেনের মতো নির্যাস ছেড়ে চলে যেতে হয়–
এই যাওয়ায় কোনো তরিকা নাই
অজানা নারীর গাত্র আবিষ্কারের শিহরণ ঘিরে ফেলে
আমরা লুকোতে পারি না।
এই দেহ ও তার নিমজ্জন উজাড় করে একদিন
যে কোলাহল নেমে যাবে– বন্ধু তার বাহন হবে!

পরান ব্যাপিয়া যাও

এই দিন-রাত্রি সাপলুডু খেলা
ডালে-বৈডালে হাড়-গোড়ের সংসার। সংসার বড়
মনোহর জিনিস; এই পৃথিবীতে মনোহর দু'একটা ব্যাপার
থাকলেই চলে; চলে যায় দিন-রাত্রি—
আমরা হয়ে পড়ি তার ধূর্ত অনুষঙ্গ।

মই দিয়ে চূড়ায় উঠি আবার শর্পমুখে তলায় নামি; প্রাণান্ত
নামলে হয়ে যাই দৃশ্যবন্দি। আর দৃশ্য মানেই দ্রষ্টব্য নয়
দ্রষ্টার এক প্রকার মনোদাহ্য ভূমি।
বংশকুল রক্ষার নামে আমাদের ডুবসাঁতার এক রহস্যময় তন্দ্রা
যা কখনোই আমরা ভেদ করে যেতে পারি না; না ঘুমে, না জেগে
কোনো স্থিতাবস্থা নেই, তবুও আমরা জলাধার ভালোবাসি
কখনো কখনো মনে হয় রুই-কাতলার চেয়ে বেশি; এই
ধরনের মনে হওয়া আমাদের চরম অসুখ।
এই প্রকার অসুখে-বিসুখে আমাদের রোপণ করা
সকল চারাগাছ বিকারে ভরা।

সহমরণে নাই

ফিতা টেনে চিহ্নিত করেছি ব্যক্তিগত নির্জনতা
এরপর আর কারো সঙ্গ মানি না
তোমরা যারা মাছ-ভাতের মতোই চাইছ আমাকে
মেথরের পাকস্থলী থেকে আমি
চিৎকার করে বলছি
ওই কাঁড়ি কাঁড়ি মুখাভিমান আমার দিকে
গভীরভাবে প্রস্তুত
এতে আমি বিব্রত ও হতাহত; আমার শিরাগুলোয়
মৃত্যু নেমে আসে
সামান্য বেঁচে থাকার জন্য একটু জনবিরান চাই
যাকে কেউ ছুঁতে আসে না—
ওই মেথরের পাকস্থলীই আমার বাণগ্রস্ত।

সর্বপ্রাণ

পাতা আর পাতা
তারা সম্পর্কে কী
ঘাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লো রোদ
তারে বা কী বলি
মায়ের গালে যে টোল দেখেছিলেন বাবা
তার নামও প্রকৃতি
মানুষ সেখানে এক প্রকারের বনায়ন
যেখানে অন্য কিছুরাও আছে।

প্রকল্প

আমার প্রেমিকা নিলে তুমি
তোমার প্রেমিকা নিলাম আমি
এরপর চললো বউ বানানোর মহড়া
মরণপণ প্রতিযোগিতায় সকল পক্ষ
পাটকাঠি আর বাঁশ সংগ্রহে ব্যস্ত
ঘর বানাতে গিয়ে বাঁশঝাড় উজাড়।
বাঁশ আমাকে দিলে তুমি, আমিও তোমাকে।

একদিন তুমি একটা নাদুস-নুদুস বউ বানিয়ে
ফেললে। আমি বানালাম নাটাই-ঘুরি।
এতে তোমার অনেক বাঁশ-কাঠি লেগেছে।
আমার লেগেছে আসমান ভরা বাতাস।
সবকিছু কাটাকুটি শেষে
আমাদের হৃদয় এখন মনিহারি দোকান
কে গেল, কে এলো– সবই মুদ্রায় প্রমাণ।

ফিদেল

এক সঙ্গে বসে ভাত খাওয়া হয়নি আমাদের
দিন শেষে আমি তুমুলভাবে বুঝতে পারছি
এ দেশের ভাতের হাঁড়ির পাশে তুমি ছিলে
আগুনের সন্ত
তোমাকে নিয়ে ছেঁউরিয়ার আখড়াবাড়িতে
ভাবচঞ্চল সন্ধ্যায় বেড়ানোর কথা ছিল।
রাত জেগে শুনতে চেয়েছিলাম বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর।
কোনো এক কৈবর্তকন্যার কথা মনে আসে,
তোমার কথা তুলতেই বলেছিল–
ওহ! সে এক মস্ত প্রেমিক।

বোধোদয়

আমি তোমাকে মুখ দেখাই, তুমি দেখাও
মুখের মতো একটা কিছু
এতে আমার ভ্রান্তি বাড়ে দূরে ও কাছে
শহরের এই সালতামামি প্রতি বছরই আসে।
স্মৃতি দিয়ে মুখ ধুই আগে-পরে যত
আসলে ঠিক মুখ হয় না মুখের মতো
ঘুমিয়ে আমি অল্প দেখি, জেগে দেখি না কিছুই

মানুষ দেখা হয়ে গেছে, এবার দেখবো বাবুই।

তোমার গ্রাম

তুমি নেই।
আমিই তোমার নাম ধারণ করলাম
তারপর একিদন আমিও চলে গেলাম।
এখানেই গল্পটা শেষ হতে পারে।

গাছতলায় বসতেই একটা মরা পাতা এসে
পড়লো। মনে হলো স্মৃতির টিলায় এসে
একটা ফড়িং বসলো।
হয়তো তারও একটা ভ্রমণ শেষ হলো
হয়তো তারও কেউ ছিল, এখন নেই
কিংবা কুড়ানির জন্য অপেক্ষা কিংবা
নতুন আরো একটি পর্ব।

আরো কিছু পর বুঝতে পারি– কেউ না
থাকলেও গল্প চলতে থাকে চরিত্র পুড়তে পুড়তে।
তারপর ছাই ফুঁড়ে মাথা তোলে তোমার গ্রাম

দুরারোগ্য গান

এই যে আমি, আমার ব্যক্তিগত হৃদয়
বিব্রত তামাশা ছাড়া কিছুই না
কোলাহল থেকে নির্জনে প্রতিপদে আমার
বিব্রত হওয়া– জানি এক প্রকার অসুখ,
কোথায় কার কাছে রাখি
নিজের অজ্ঞাতে চোখ মুছতে থাকি
নিজের ভেতরে আরো বেশি ভেতরে ঢুকেও
আমি নশ্বর হতে পারি না
আমার পাঁজর আমাকে বিদ্ধ করে
আমার চোয়াল আমাকে খেতে আসে কিন্তু
খেয়ে ফেলে না
আমি আরো বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ি
আমার কোনো শিক্ষা কাজ করে না
আমার কোনো সংস্কৃতি থাকে না
আমি একটি নর্দমারও আধার হতে চাই
যদিও নিজের আধার জানি না
পালাতে গেলে মনে হয়— আমি তো জাহিরই হইনি
অস্তায়মান সূর্যের দিকে উদ্ভ্রান্তি নিয়ে হাঁটছি
পেছনে পড়ে থাকছে আমারই নির্মিত নির্জন

দাউ দাউ করে জ্বলছেন যিনি

বাবাকে খুঁজি
টিকেট কাউন্টারের কোলাহলে, যাত্রাপালার
নেপথ্য বচনে, জিলাপি দোকানের আশপাশে
নাপিতের ক্ষুর-কাঁচিতে, হাওয়ার উল্টোদিকে
কোথাও পাওয়া যায় না তাকে

আমাদের বাবা
ক্ষুধা-মন্দায় বসেও গলা ছেড়ে গাইতেন;
আসর বসিয়ে রাতভর জাগিয়ে রাখতেন গ্রাম।
এই সব ভাববৈঠকের চারদিকে ঘুরতো
জীব ও পরমের স্বরূপ সন্ধানীবলয়
দোতরা খঞ্জনি খমকের তালে মুর্শিদের
আসন কেঁপে উঠতো
সেই রাত্রির মহিমায় আত্মার আলোকে
খুঁজছি বাবাকে
অনাড়ম্বর স্মৃতির বিবরে দাউ দাউ করে জ্বলছেন যিনি।

স্বপ্নবধের বিদ্যা

হেমা কৈবর্ত তার জোয়ান পুত্রকে স্বপ্নবধের বিদ্যা শিখতে বলেছিলেন। হেমা কৈবর্তরা এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে জীবন চুলায় দেন। এরপর পুড়তে থাকেন। এভাবেই কৈবর্তপাড়ায় চন্দ্র-সূর্য পার হয়।
আমাদের গাঁয়ের ওই পাড়াতেই জন্মেছিল বাল্যবন্ধু কৃষ্ণা। সে তার স্বপ্নবধের কথা আমাকে বলতে চেয়েছিল। কৃষ্ণা যে বছর ভিটি ছেড়ে কলকাতা চলে যায়, সে বছরই জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলে ভোট চান বিচারপতি সাত্তার। আমাদের এখনো জানা হয়নি জিয়ার স্বপ্নটা কী, জানা হয়নি বন্ধু কৃষ্ণা কেন দেশে ফিরে এসে আমাকে তার স্বপ্নের কথা বলতে পারেনি।
জানি না, হেমা কৈবর্তের জোয়ান পুত্র স্বপ্নবধের বিদ্যা শিখলে ফসল ওঠে কার ঘরে।

আমাতে-তোমাতে ক্রমবিকাশ

বৈচা মাছের মতো মুখ ছিল খুনিটার। তারপর আর তাকে পেছনে তাকাতে হয়নি। গ্রাম-শহর সবাই মেনে নিয়েছে। দীর্ঘকাল বিরতিতে গেল সে। এরই মধ্যে তার মনে ঘুর ঘুর করা খুনের বিষয়টি মলিন হয়ে এলো।

সে একটা চমৎকার গ্রাম তৈরি করেছে। এতে তাকে পাহাড় কেটে রাস্তা বানাতে হয়নি। বরং অনেক ধরনের রাস্তাই তাকে খুঁজে পেয়েছে। সেসব রাস্তা মাড়িয়ে যারা বিচিত্রগামী, তারাও তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায়। এখন আর তার বৈচা মাছের মতো মুখটা ততটা প্রকট নয়। আশপাশের সঙ্গে তার মুখের বৈষম্য কমে এসেছে। ফলে সামনে তাকানোই তার কাজ।

তোমার আলোকপ্রাপ্তি ইতিহাসের হেতু নয়

এবার তুমি একটি স্মরণার্থী শিবিরের কাছে পৌঁছে গেলে। তোমার উদরপূর্তি নিয়ে সন্দেহ অনেকের। তুমি একটা অস্বস্তি বোধ করছ। আলো দেখছ না।

অন্ধকারে ডুব দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের মতো শীতল জনসম্পদ হয়ে গেলে। তারপর থেকে আমরা কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ধকার দেখলে ক্ষুধামন্দায় ভুগতে থাকি। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পাক খেয়ে পড়লাম আরেকটা পাকের ভেতর। বুঝলাম, এবার পেকে উঠবো। আসলে না। একটা ধুলার পথ শুরু। প্রস্তর যুগে যারা আগুন এনেছিল, তাদের চোখে ছিল আত্মার সুর। তোমার চোখে যারা আলো মাখিয়েছে, তারা প্রতিবেশী। এভাবে তোমার আলোকপ্রাপ্তি কোনো ইতিহাসের হেতু নয়।

কুয়াশায় ঘুমের চুমু

এই রাত আমার স্বর্গের ডাক
পাতাগুলো শুয়ে আছে শীতের পাঁজরে।
শীত শুয়ে আছে আমার গতরে।
শত কলঙ্কের ডাকেও ঘর ছাড়তে পারি।
চরম ঘুম এসে নিয়ে যাক আমাকে।
জানতে চাই না– যেমন জানতে চাই না
আমার প্রেমিকার সংখ্যা।
কুয়াশার ভেতরে লাল চাদরে মোড়া আমার
আশা, ওই তো দেখছি মুলা ক্ষেতের
আল ধরে আসে।
কুয়াশার মন্দ্র বিরহে পড়ে থাক আমার যৌবন,
ঘুমের চুম্বনে জাগাবো নিঠুর মরণ।

ঊনমানুষের দড়ি খেলা

সাপের পেটে রাত, রাতের পেটে
ঊনমানুষের দড়ি খেলা
বিরান সংশয়ে দড়ি হাতে ঘুরে ঘুরে
বুকে জেগে ওঠা নিজের কবর
দু'হাতে সরিয়ে যাচ্ছ
এভাবে কতো দূর যাবে
চিরতার মতো করে তিতা ধরে রেখে
টেনে নিচ্ছ বেঁচে থাকার সংস্কার

যতবার দড়ি হাতে গিয়েছিলে মাঠে
ছায়া তাড়া করে ফিরেছ কায়ায়
চারপাশ থেকে ছুটে আসা সহস্র অরুণ
বিদ্ধ করে গলায় আটকা শ্বাসপাখি
পুনরায় দড়ি হাতে খুঁজছ তারে
আপন কঙ্কালের নকশায়
যখন রাতের ফস ফস শব্দে
সেলাই হওয়া চোখ দুটো
সাদা ভাতের মতো চাক্ষুষ।

উন্নয়ন প্রসূত চমকের দিকে

পুরনো ঘড়ি, একটি বেওয়ারিশ কাঁচামরিচ এক সঙ্গে রেখে ছবি তুললে। তারপর পানির সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে বললে— চমৎকার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য যে দেখলো, সেও বললো— চমৎকার। যে দেখলো না, সেও বললো। আরেকটু সামনে গেলে। এবার নামি-দামি গাড়ির নম্বরপ্লেটের ছবি তুলে আগের নিয়মে খেলে। একটি কুমুদ, আব্বু-আম্মুর কাবিননামার সঙ্গে সেলফিও খাওয়া শেষ।
খেয়ে-টেয়ে তুমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের মতো শীতল জনসম্পদ হয়ে গেলে। আর আমরা তোমার ভোজ্য তালিকাটি পাঠ করে মনে করবো উন্নত বিশ্বের শর্তায়নে কোনো সিনেমা দেখছি! যাতে অভিনয় করছে ইচ্ছাপূরণের টেপাপুতুল। ওই সিনেমাটি খাওয়ার জন্য বসে আছেন থুত্থুড়ে এক বুড়ো মানুষ। তার চোখ ফুলে ওঠা লাশের মতো ক্ষুধাবিমুখ।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে চঞ্চল বাড়ি থেকে বের হয়। সেদিন কিংবা পরের দিন এক মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল। গেছে কিনা জানা যায়নি। এও জানা যায়নি, সপ্তাহখানেক আগে শহরের বর্জ্য টেনে চলা নদীটায় তার লাশ পাওয়া যাবে। শিল-পাটার মতো বুক ছিল চঞ্চলের। বুক থেকে কোমর পর্যন্ত লাশটি ফাঁড়া। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলে আমার একটা চোখ ফুড়ুত করে ফাঁড়া দিয়ে ঢুকে পড়ে। সম্ভবত আমি চোখটা টেনে বের করার চেষ্টা করছি। এমন সময় চঞ্চল আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলে— আগে তো ভেতরটা দেখিসনি, এখন দেখ।

হায় আল্লাহ! আমি এ কী শুনলাম!

বেতাল বসন্ত

(রহমান সিদ্দিক : স্বর্গচ্যুত সন্ন্যাস)

আমিও ঘোরবসন্তে তোমার মতো পাতা পাতা
আমিও আলের পাশে ভাঁট ফুলের শুভ্র মৌনতা
চোরা কাঁটায় আটকে যাওয়া অনুরাগে
ধুয়ে গেছে তুরীয় রক্তপাত
আমারও ডানার ভার ছেড়ে গেছে পালক
আমারও সোনাবন্ধু পথ মিশেছে ধান-দূর্বায়

তোমার ডাকনাম, আমার অশ্রুনহর
তোমার সন্ন্যাস মিশনে আমি সহোদর
ফেলে আসা দরিয়ায় ভাঙা দর্পণ—
মুখ দেখার আগেই ডুবে যায়
আমাদের নারী প্রহর কাঁঠালপাতায় মুড়িয়ে
তাল দেয় বেতাল বসন্তে
আমাদের রক্ত-মাংসে বলকায় শ্রেণির আগুন

এভাবে তামাদি স্মৃতির রোষ আছড়ে পড়ে
এভাবে আহত খরগোশ উঁচিয়ে ধরে শূন্যতা
ধানপাতার ঘেরে চুপসে থাকে ভয়ার্ত ডাহুক
ঘুমে নিরাকার মানুষ তবুও শিকার ভোলে না
তুমি, আমি, আমরা ঘুণ শিল্পের সাবস্ত আধার
তুমি, আমি, আমরা কামকানা প্রেমিকার সঙ্গীত

সখার আয়না

গতর ছুঁয়েছে পরীর বিষ
ধানের মস্তক কাটা
বাতাসে ভাসে শির
ভ্রূণ হত্য হবে কী মা-মাসির!

সাধন অঞ্চলে নিথর
প্রতিভার থোড় কেটে
তৈরি হয় বোকার টিউমার
রাত্রি সাজায় ভাঙনের চুরমার

সুমা দাস ঘুমিয়ে আমল করে
খোয়াবে অবিরত খুনের ডিম
স্বপ্নান্ধ মানুষের ঘোর কাটে না
ঘুমের চাপে ভাঙে সখার আয়না।

বলুন মাননীয়

আমাকে দেখতেই হলো
মাতৃজঠরে গুলিবিদ্ধ ভ্রূণ
রক্তাক্ত জঠরে ভ্রূণ হত্যার উৎসব
এভাবে ক্ষমতাকে আমি কোনোদিনই
ক্ষমা করতে পারি না
প্রতি ইঞ্চি যন্ত্রণার দামে
পাওয়া রাষ্ট্র আমার বুকে বসে
শিশু হত্যার উৎসবে মাতে।

সভ্যতার টিউমার আমাকে
বইয়ে নিতে হয় তোমার কাছে
কী করে জানবো
তার মন্দ্র নাদে কতো হাহাকার!

মানীয় সরকার প্রধান বলুন—
আগামীতে আমার স্ত্রী প্রসব করবে
নবজাতক, নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেসনোট!

বাইচ

মুহাম্মদ মুস্তফা তার আবাদ করা পাট ক্ষেতে পাটপাতার কান মলে দিয়ে বলে, তোরা আমার সব খাইলি— এখন তড়তড়ি বেড়ে ওঠ।

তার এই নির্জন তাড়নায় পাটচারাগুলো যেন দ্রুত বেড়ে ওঠে। পরের দিন নোয়াব আলীর ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা বুঝতে পারে নিজের ক্ষেতের পাটের চারা লায়েক হয়ে উঠছে।

এতে সে তার চাওয়া-পাওয়ার একটা বুঝ পেয়ে যায়। এমনকি কিছুটা পেছনে তাকাবারও ফুরসত হয়— যে বছর সে যাত্রাপালার নায়িকার একতরফা প্রেমের টানে রাতে যাত্রা দেখতো আর দিনে প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করতো, সেবার পাটের বাজার পেয়েছিলেন তার বাবা মুহাম্মদ খবির উদ্দিন। তাই জামিলা খাতুনের সঙ্গে বিয়েটাও পাকা হয় তখন। এরপর জামিলা খাতুন তার আবদারের কিছুই বাকি রাখে নাই– এই মূল্যায়ন শেষে মুহাম্মদ মুস্তফা ক্ষেতের আল থেকে উঠে সোজা রওনা দেয় উত্তরের বিলের দিকে।

ততক্ষণে সূর্যটা বিস্তর লাল হয়ে আজরাইলের খাবলার মতো দেখাচ্ছে। মুহাম্মদ মুস্তফা দেখলো তার সামনে-পেছনে দুইখান খুঁটি। তাকে হয় ডানে, না হয় বামে যেতে হবে।

আসক্তি ও দস্তার সুর

আমাদের পোড়োবাড়ির উঠোনে আপনি
মড়কের শাসক
চারদিকে ঘুমবাতি আসমানে আপনার
বেসামাল মৌমাছি
আমরা আপনার ভাষায় তাগড়া তরুণ ফুল
ফুল-পাতায় আমাদের এই অখণ্ড তরিকা
আপনি তড়পান
সুদিনের খৈ-মুড়ি দিয়ে আমরাও আপনাকে
আমল করি
আপনি মুদ্রাপানি দিয়ে আমাদের বুনিয়াদি
বাণিজ্যে নামান
আমরা যত খোকা-খুকি আগুনপ্রিয় অবলা
সাঁওতাল রোহিঙ্গা গারো মুরং
বীরবলে ফেরি করি আপনার গরল ভার।

এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ মৌনতায় পার হয়ে যাই
মহামৃত্যু আর পয়মন্ত তাবিজ

শিরোনামহীন

রুধির কাঁপাতে কাঁপাতে যুবক এলো
বললাম, বহুদিন বুড়ো কালটা রেখেছ ধরে
যুবক মাথা নাড়ে আর দৌড়ায় সূর্যাস্তের দিকে

এরপর মরা মাঠ, মাঠের ফাটল দেখতে থাকি
একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে
মাতামহী বলেন– কার্যকর পথ হচ্ছে ব্যক্তির ক্রোধ

পথের পাশে দেখি
তর তর করে আসে-যায় ঘোরশূন্য মানুষ
যারা ভূমি খায় আর এগোয়
ইতিহাস থেকে দায়িত্ব তুলে নেয় ইতিহাস
সংবর্ধিত হয় কালখোর পূরাণ
মানুষ তার শৈশবের সম্পূরক জীবনই
বইয়ে নিয়ে যায় মরণে

গাছ

গাছের ব্যর্থতা এই— সে আমাকে নির্দিষ্ট করে না
ফেলে দেয় ছাঁচের বাইরে
যখন কিছু করার থাকে বা থাকে না
তখন আমি গাছের কাছে যাই না
সারা দিন ছাঁটকাগজের মতো নগরের সর্বত্র
ঘুরে ঘুরে ময়লা লাগাই মুখে।
রাতে অশতর্ক ঘুমে যাই
মাঝে মধ্যে বাতাসবিপত্তি হলে
নড়ে-চড়ে শুই
আর স্বপ্ন দেখি– রাষ্ট্রের মন্ত্রী ফিতা কেটে
আমাকে উদ্বোধন করছেন বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে
ঘুম যখন ভেঙে যায়
অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ি নিজের সম্পর্কে
ছাঁটকাগজ আর বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি
কোনটায় আমাকে মৌলিক দেখায়!

মন আছে মৌনতা নেই

নিরন্তর এই নগরে মন আছে, মৌনতা নেই
নাগরিকরা প্রায়ই আমাদের চুপ থাকতে বলেন
এতে তাদের ঘুম ভালো হয়, যকৃৎ গাঢ় হয়।
আমরা গ্রামবাসী দলে দলে নগরে এসে
মুখরতায় সব মধু হারিয়ে হাটবাজার হই।
কাম ও কামনার রন্ধনশৈলী আমাদের
নিরন্তর করে, নির্জন করে না।

আমরা থৈ পেয়ে যাই রাষ্ট্রের জরিপে
এতে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার আমলনামা হয়;
আমরা হয়ে যাই ঘরে ঘরে মন নিয়ন্ত্রণ কমিশন।
এখানে শুধু জীবিতরা নন, যারা মরে গেছেন
তারাও পেয়ে যান মুখরতার নিবন্ধন।

জল্লাদের পরিপত্র

আমাদের মা-বাবা, আমাদের বোন
যে কারো নামই সুন্দরবন
জলজ বীজে পাতা-পত্রে গড়েছি শোণিত
কী করে ছাড়াই আমার কান্নারও অতীত।

জল্লাদের পরিপত্রে
পুড়ছে বাতাস অরণ্যের স্মৃতি
যারা চাইছ না বুনো গন্ধ বৃষ্টি বাতাস
তোমাদের হৃদয় পাঁজরের দাস
মানুষ পুড়লে অঙ্গার হয়
অঙ্গার পুড়লে হয় না মানুষ
বন পুড়িয়ে আলো চাইছ
আলো পুড়িয়ে পাবে না বন
আমাদের মা-বাবা, আমাদের বোন
যে কারো নামই সুন্দরবন

ভবে মোর দেহতরী

পাথুরে পিন্ধন উঠাও, দেখাও দরিয়ার শুরু
এইখানে অনলে নেমে গেছে অতসী নারী
বর্ষণে কর্ষণে মহিমা সিঞ্চন করো; ডোবাও
রতি ওঠা মাথা
একবার, পাঁচবার, সাতবার তুঙ্গে ওঠা শরীর
আলগোছে নামিয়ে রাখো অন্তরে
ভবের বাতাস মাখাও তারে
যেভাবে শুরু দুই দেহে এক মাহফিল।

কোনকালে কে ছুঁয়েছিল এই আদি রঞ্জন, বিবাদীর রিপু
লোকায়নে ছড়িয়ে গেছে তার তূরীয় নন্দন
নির্মাণের অমোঘ আগুনে চুম্বন করো পরমেশ্বর
তারপর স্মৃতি হারিয়ে তার আসনে বসো
কোনো প্রকার সন্ধিবিহনে ফুটাও ফুল শত শত।

রাতে মিশে গিয়ে তৈরি করেছি লোককলঙ্ক

পারিনি
আর তুই যদি পারিস আমাকে দেখাস
ইট-পাথরের সমাবেশে
আমি কোন সভাপতি!
যার হাত ধরে এসেছিলাম
তার কিছুই মনে পড়ে না
তামা-কাঁসার মতো ঝনঝনিয়ে
একটা ফ্যাসাদ পার করলাম
আর তুই পার হয়ে গেলি
সোনালি দড়ি আর
চাঁদভাবনার বুকতলা।

যেখানে বাঘও বসে না।

হাটুরে

(অচিন পাঠ্য : অমীমাংসিত মুখ)

এখানে রাখলাম জল
তোমার মুখের মতো অবিরল
হাঁটতে হাঁটতে দেখা
অনার্য মাঠ, মোটা ভাত আর নুনের খনি
পার হয়ে আসা আরণ্যক
উল্টো হাওয়ায় মুখ ফেরানো বন্ধুতা
ঝরে পড়ুক আয়ুবর্ষের পুনঃপুন শূন্যতায়
বাজুক রোদ্রৌজ্জ্বল দুপুর
এমন একটি মুখ দেখার জন্য
দীর্ঘ ঘুমপথ হেঁটে আসা।

জন্ম এক প্রকার ঝরা পাতা
যা চুলোয় দেন কুড়ানির মা
আর প্রকৃত হাটুরেরা।

সরকার ঘাস কাটে

সরকার ঘাস কাটে
মৃত্যুর কবলে পড়া নদী শীতলক্ষ্যা
আলকাতরার মতো জল বইয়ে ফেরে
আমার বুকে।
আমি বুক খুলে ধরলে সে ঢুকে পড়ে কবরে
এরপর আমি বুকের ভেতর কেমিক্যাল ভরে
ফিরে আসি।

সরকার ঘাস কাটে
বুড়িগঙ্গা মাতালের বমির মধ্যে সাঁতরায়
আমি তার কাছে গেলে যেতে পারি
কিন্তু এরপর ফিরে এসে কোথায় যাবো!

বস্তা বস্তা গজব নেমে আসে আমার জন্য
তখনো সরকার ঘাস কাটে
আমি সরকার কেটে-কুটে বানাই
ঘাস খাওয়ার জন্য এক অহিংস বলদ।

এরপরও তোমাকে দেখতে থাকি

ভাইয়ের হাতে বোনের গুঁজে দেয়া
দুটি নোট আমি নেড়ে দেখছিলাম
পূর্বাপর ভাবার আগে ওই নারী
বোন প্রমিকা ও বন্ধুর মতো বলে—
এতে দুঃখের কিছু নেই
এক জীবনের কাছে আরেক জীবনের দায়
মাঝখানে মুছে যায় আরো একটি নাম
এরপর বেনামেই গড়ায় সম্পর্ক
আগুন গুঁজে দিয়ে আমরা হেঁটে
যাই কারো না কারো বুকবন্ধে
চিরলের ভেতর থেকে উঁকি দেয়
অন্য এক আগুনের সুর।

জীবনব্যাপিয়া বাঁচো

মরণেই বেঁচে যাবে তুমি
মিছে মিছে মৃত্যুভয়ে ছুটছ
তোমার পেছনে নেই ইশারা
সামনেও না
তবুও মরণ তোমার
দুই নয়নের একটি।

বেঁচে থাকার সব ব্যাকুলতা
তোমাকে পাথরে বসিয়েছে
সেই পাথরও নেমে গেছে দরিয়ায়
তুমি এখন দরিয়াপাড়ের নির্জনতা
দু'হাতে ধরা ফাটা চাঁদ
মাথায় ভরেছ মৃত্যুর ওম।

যারা তোমাকে মরণতাড়নায়
সেলাই করছে
ফালি ফালি করছে ঘুম
তাদের সুবর্ণ ঘাতে
তুমি আর জাগবে না
জাগবে না তোমার মৃত্যুও।

চোতা

বেগুনি সন্ত্রাসে অনিশ্চিত দলন
তুমি, আমি, আমাদের গা পৌরাণিক চোতা
যা থেকে মনে করতে পারি হাটবার ও হাটের প্রলাপ।
কতো পদ কাটা-ছেঁড়া হয়, যুক্ত হয়
তুমি, আমি, আমরা পণ্য মোড়কে খুঁজি পড়তা।
খুঁজি না গড়পড়তা। কেননা গড়ের কাছে আমার
অনেক ঋণ, তারও কান-মাথা আছে, তারও শ্রম হয়
পরের কথায় কান ভারী হয়, মৃতের মতো নিষ্কণ্টক ঘুম হয়।
আমাদের যেমন প্রতিবেশীর স্ত্রীর লাল ঘাড় দেখে লোভ হয়
তার বেগুনি সন্ত্রাস দেহের ওজন কমায়, বুদ্বুদ ওঠে
বাজারের তালিকা ঝোলানো শরীরটায়
খুদ্রঋণের কিস্তির মতো মুঠো বদল হয়।

কিছু সময় নদীবর্তী কুয়াশায় গেঁথে গেল

যেভাবে নদী দেখা হলো
সেভাবে স্মৃতি লিখন হলো না
তাই কিছু সময় নদীবর্তী কুয়াশায় গেঁথে গেল
তুমি সেভাবেই বাড়ির দিকে যাত্রা করলে
কোনো উদ্ভিদে রক্ত দেখা গেল না
তবুও এ দেশে নদী আর উদ্ভিদে একাকার বাসনা
পড়ন্তবেলার দিকে চেয়ে দেখি
ঘরমুখো মানুষের ছায়ায় আমাকেও দেখা যায়
মাটির ওপর শক্ত করে খাড়া আছে এক প্রবীণ
তার হাতে মাতৃভাষার বর্ণমালা কেউ দেখলো না।

আমিও দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে
এড়িয়ে যেতে থাকলাম
জিওল মাছর মতো ঘুর ঘুর
পুরনো দিনের গন্ধ শুঁকতে থাকলাম
নদী এসে সন্তানের মতো বুকে লেপ্টে পড়লে
স্মৃতি দত্তক নিতে গেলাম তোমার কাছে।